GOD & TRUTH(ঈশ্বর ও সত্য)

গান্ধীজীর সেশ্বরবাদ ঃ একজন দর্শনের শিক্ষার্থীর পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গান্ধীজীর দর্শনকে কোনো স্বীকৃত দার্শনিক মডেলে (ছাঁচে) পর্যবসিত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তিনি দর্শনে কোনো কেতাবি শিক্ষালাভ করেননি। তাই তাঁর কাছে সর্বেশ্বরবাদ ও সেশ্বরবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলা যায় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল বৈষ্ণবীয়। বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল এবং যে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি বড়ো হয়েছিলেন তাতে সেশ্বরবাদের মূল নীতিগুলি মনে গেঁথে গিয়েছিল।

ভারতে বৈষ্ণবেরা সেশ্বরবাদীদের সমুৎকৃষ্ট। তাঁরা বেদ ও উপনিষদসমূহের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী এবং সেগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারা ও বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করেছিল তা গ্রহণ করেননি। মহান অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যে জগৎকে আপাতভাবে সৎ বলে মনে হয় তা নিছক ব্যষ্টি অবিদ্যা সৃষ্ট ভ্রম। তাই স্বভাবতই অদ্বৈত বেদান্তীরা কখনো ঈশ্বর বা কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সত্তা যদি অনিবার্যভাবে এক হয়, বহুত্বের প্রত্যক্ষ যদি অবিদ্যা বা ভ্রমের ফল হয়, তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই অসৎ হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, বৈষ্ণব চিন্তাবিদেরা জগৎকে সদ্রূপে গ্রহণ করেন। তাই তাঁরা জগতের স্রষ্টা ও ধারক বা রক্ষকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অদ্বৈত বেদান্তী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও অবর্ণনীয়। সুতরাং সত্তার জ্ঞান থেকেই মুক্তি। যেহেতু সত্তা নির্গুণ, তাই সত্তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হতে পারে না। ভক্তিস্থলে সর্বদাই আন্তরব্যক্তি সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়। তাই অদ্বৈতীরা মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানমার্গ অনুসরণের পরামর্শ দেন। সেশ্বরবাদী দৃষ্টিতে বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর হলেন ব্যক্তি-ঈশ্বর। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে আবেগহীন, শীতল জ্ঞানমার্গের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং, জ্ঞানমার্গীদের সঙ্গে ঈশ্বরের সর্বদাই একটা দূরত্ব থেকে যায়। বৈষ্ণবদের মতে ঈশ্বরানুভব বা ঈশ্বরের উপলব্ধি প্রয়োজন। তাই, মুক্তির একমাত্র পথ হল অনুভব ও ভক্তির মার্গ। বৈষ্ণবেরা জ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও এটা অনুভব করেন যে মুক্তির জন্য ভক্তি ও আবেগতাড়িত সমর্পণ প্রয়োজন। প্রধানত এইকারণেই বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ভারতে এত জনপ্রিয়। এটি এতই সহজ পথের পরামর্শ দেয় যা যে কোনো মানুষের পক্ষেই অনুসরণ করা সম্ভব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজীর দর্শন কঠোরভাবে সেশ্বরবাদী। এটা সত্য যে গান্ধীজী কখনো কখনো প্রায় অদ্বৈতীদের মতো সত্তার নির্গুণ স্বরূপের কথা বলেন। তিনি এরূপ বলেছেন এইকারণে যে তিনি মনে করেন প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট তাঁদের বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য 'সগুণ' ও 'নির্গুণ'-এর তাত্ত্বিক ভেদ অবান্তর। বস্তুত, তিনি মনে করেন যে নিছক বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার জন্য নয়, শক্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্যও ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন। ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে। তিনি বলেন, "....যিনি নিছক বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করেন, তিনি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হতে গেলে অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে শাসন করতে হবে এবং তাকে রূপান্তরিত করতে হবে।" ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হলে এবং আন্তর-ব্যক্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল তখনই ঈশ্বর আমাদের অন্তরের শাসক হতে পারেন। ভক্তি মার্গীদের জীবনাচরণের দ্বারা গান্ধীজী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই, ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। কোরান ও বাইবেলের পাঠ গ্রহণের ফলে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা লাভ করেছিলেন।

ঈশ্বর ও সত্যকে অভিন্নরূপে ঘোষণা করায় গান্ধীজীর ঐশ্বরিক ভাবনায় একটি সমস্যা দেখা দেয়। সত্য একটি নৈর্ব্যক্তিক নীতি, আর গান্ধীজীর ভাবনায় ঈশ্বর হলেন ব্যক্তিবিশেষ। তাই, ঈশ্বর ও সত্য কীভাবে অভিন্ন হতে পারে?

সত্যই ঈশ্বর

এই সমস্যার সমাধানে গান্ধীজীর ভাবধারা/চিন্তাধারায় প্রবেশ করা জরুরি। গান্ধীজী এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান স্পষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেন, "যৌবনের প্রথমদিকে হিন্দুশাস্ত্র" থেকে ঈশ্বরের সহস্র নাম শিখেছিলাম জপ করার জন্য। কিন্তু এই সহস্র নামই সম্পূর্ণ নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের যত সৃষ্টি (জীব) তত নাম। আমি মনে করি 'সত্য' ঈশ্বরের একটি নাম। আমরা এও বলি যে ঈশ্বর নামহীন। যেহেতু ঈশ্বরের বহুরূপ, তাই আমরা তাঁকে রূপহীন বলেও গণ্য করি। যেহেতু তিনি নানামুখে আমাদের উপদেশ দেন, তাই আমরা তাঁকে বাক্‌হীন বলে গণ্য করি। ....যদি মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমার কাছে ঈশ্বর হলেন সত্য।"

ঈশ্বর হলেন সত্য—গান্ধীজীর এরূপ বলার সপক্ষে একটি ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়। প্রথমত, এটি সার্বিক সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম অন্বেষণের ফল, এটি কোনো বর্ণনা নয়। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরকে সত্যরূপে বর্ণনা করা হয় কেননা কেবল ঈশ্বরই সৎ। গান্ধীজীর মতে সত্য ঈশ্বরের কোনো গুণ নয়, বরং ঈশ্বরই সত্য। তাঁর মতে 'সৎ' শব্দটি থেকে সত্য নিঃসৃত হয় এবং 'সৎ' মানে 'অস্তিত্বশীল'। সুতরাং ঈশ্বর সত্য—একথার অর্থ হল কেবল ঈশ্বরই অস্তিত্বশীল।

কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধীজী 'ঈশ্বর সত্য'-এর পরিবর্তে বললেন 'সত্যই ঈশ্বর'। সাধারণভাবে এরূপ আবর্তন যৌক্তিক সমস্যার সৃষ্টি করে। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এরূপ বচন থেকে 'সকল মরণশীল জীব হয় মানুষ'—এরূপ বচনে উপনীত হতে পারি না। কিন্তু এরূপ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন হয়। সুতরাং কেউ বলতে পারেন যে 'ঈশ্বর সত্য'—এই বচন থেকে 'সত্যই ঈশ্বর' এরূপ বচনে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গান্ধীজী যে কারণে বচনটির রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন তা এত সহজ-সরল নয়। তিনি বলেন, "আমার অন্তঃস্থল থেকে বলতে পারি যে ঈশ্বর ঈশ্বর হলেও সর্বোপরি তিনি সত্য। কিন্তু দুবৎসর আগে এককদম এগিয়ে বললাম সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর সত্য ও সত্যই ঈশ্বর—এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এবং আমি নিরন্তর অদম্য কঠোর সত্যান্বেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম।"

এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে বচনটির রূপান্তরীকরণের পশ্চাতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি রয়েছে। একটি যুক্তি হল 'সত্য' শব্দটি 'ঈশ্বর' শব্দের মতো দ্ব্যর্থবোধক নয়। 'ঈশ্বর' শব্দের দ্বারা সকলে একই বিষয়কে বোঝে না, ঈশ্বর সর্বেশ্বর, সেশ্বর, বহুঈশ্বর, এমনকি ধর্মহীন ঈশ্বরও হতে পারে। কিন্তু 'সত্য' শব্দটির তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বচনটি রূপান্তরীকরণের অপর একটি মৌলিক কারণও রয়েছে। গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে যৌক্তিকভাবে সংশয় প্রকাশ করা, এমনকি তাঁকে অস্বীকার করাও সম্ভব। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করতে গেলে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধিকভাবে যুক্তি উত্থাপন করা যায়, কিন্তু বুদ্ধি সত্যকে নস্যাৎ করতে পারে না। জগতে বহু মানুষ আছেন যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেন এবং অবিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁরাও সত্যকে অস্বীকার করেন না। বস্তুত, সত্যকে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী উভয়েই মেনে নেন। সত্য হল এরূপ একটি বিষয় যা সর্বজন বোধগম্য ও সর্বজন স্বীকৃত। গান্ধীজী বলেন যে একজন নিরীশ্বরবাদীকে 'ঈশ্বর-ভীতু মানুষ' বলে বর্ণনা করলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু 'সত্য-ভীতু মানুষ' বলে বর্ণনা করলে সানন্দে সমর্থন জানাবেন। গান্ধীজী একারণেই সত্যকে মৌলিকরূপে গণ্য করেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্ধ ধর্মীয় ধারণাগুলি মানবজাতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। তাই তিনি 'ঈশ্বর সত্য' বচনটিকে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ঈশ্বরকে পাত্তা দিই না, যদি তিনি সত্য ছাড়া অন্যকিছু হন।'

সত্য কী? যৌক্তিক অর্থে 'সত্য' বলতে অবধারণের ধর্মকে বোঝায়, কিন্তু আধিবিদ্যক দৃষ্টিতে 'সত্য' হল যথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান সত্তার অনুরূপ। ভারতীয় অধিবিদ্যায় কখনো কখনো সত্যকে স্বপ্রকাশরূপে গণ্য করা হয়। গান্ধীজী 'সত্য' শব্দের এই সকল অর্থকে সমন্বিত করে সত্যকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। বস্তুত, তিনি শব্দটির জনপ্রিয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষ 'সৎ' এবং 'সত্য'-এর মধ্যে পার্থক্য করেন না। গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন যে 'সত্য' নিঃসৃত হয়েছে 'সৎ' থেকে এবং এর ফলেই তিনি সত্যকে সত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেন।

কিন্তু একজন দর্শনের শিক্ষার্থীর সংশয় হতে পারে, কীভাবে সত্য ও সত্তা অভিন্ন হতে পারে? সত্য হল মানব মনের দ্বারা গৃহীত সত্তার চিত্র। সত্তার চিত্র কীভাবে সত্তার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে? কিন্তু গান্ধীজী তাঁর স্বকীয় পন্থায় সমস্যাটির সমাধান করেছেন। 'বিষয়ের জ্ঞান' ও 'জ্ঞানের বিষয়'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দ্বৈতবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। ধর্মীয় দার্শনিক ও স্বজ্ঞাবাদীরা এই তত্ত্ব খারিজ করেন এবং বলেন যে জ্ঞানই সত্তা (knowing is being)। যে প্রভাবগুলো গান্ধীজীর ভাবনাকে রূপরেখা দান করেছিল, যেমন—উপনিষদ,

খ্রিস্টধর্ম, টলস্টয়ের চিন্তাধারা প্রভৃতি, সেগুলির মধ্যেও জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ সদৃশ ধারণা নিহিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, গান্ধীজী সত্যকে সত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হননি। তাই গান্ধীজী বলেন, "আমার সদৃশ অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়বিশ্বাসী করেছে যে সত্য ভিন্ন ঈশ্বর নেই। আমি যে ক্ষুদ্র, ক্ষণিক আভাস পেয়েছি তা হল সত্য কদাচিৎ তার অবর্ণনীয় দ্যুতির ধারণা দিতে পারে। আমরা প্রতিদিন যে সূর্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লাভ করি এটি তার চেয়ে লক্ষগুণ তীব্র। বস্তুত, ঐ শক্তিশালী আলোর একটি ক্ষীণ আভাস আমি ধরতে পেরেছি মাত্র।"

সত্যই ঈশ্বর—গান্ধীজীর এই উক্তি থেকে কতকগুলি বিষয় নিঃসৃত হয়, যেগুলির ধর্মীয় ও প্রায়োগিক মূল্য আছে। যেমন—ঈশ্বর নয়, সত্যই আরাধনার অভীষ্ট বিষয়। এটি প্রকৃত বিশ্বজনীন ধর্মের একটি ভিত্তি হতে পারে, কেননা 'সত্যের আরাধনা' সকল জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে।

সত্যানুসন্ধানের প্রথম দিকে গান্ধীজী ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নানা চিন্তাবিদের সান্নিধ্যে আসেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের চিরায়ত ধারণা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সমালোচনার যোগ্য। সত্যকে জানার সচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর এই উপলব্ধি হল যে যুক্তি যে কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলেও সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। তিনি দেখলেন যে সকল ধর্মের ধর্মবিশ্বাসীদের, এমনকি নিরীশ্বরবাদীদেরকেও সত্যের পতাকাতলে আনা যাবে। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে কেবল সত্যই হল এমন শক্তি যা দ্বান্দ্বিকতাময় ধারণা ও আদর্শগুলোকে এক করতে পারে। তাই তিনি বলেন, "যদি মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বর্ণনা দান সম্ভব হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে ঈশ্বর হলেন সত্য। কিন্তু আমি আরও এক কদম এগিয়ে বললাম, সত্যই ঈশ্বর। সত্য বিষয়ে কোন দ্বৈত অর্থ আমি কখনো দেখলাম না। এক্ষেত্রে 'সত্যই ঈশ্বর'—এই লক্ষণ আমাকে মহত্তম তুষ্টি দান করে।"

এর থেকে গান্ধীজীর এই ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় যে সত্যের প্রতি সচেতন প্রেম ও সত্যের আরাধনা হিন্দু, মুসলিম, এমনকি মার্কসবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদেরকেও এক ছাতার তলায় নিয়ে আসবে। একারণেই গান্ধীজী বলেন যে প্রকৃত অর্থে কোনো নিরীশ্বরবাদী নেই।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ